হেলমেট

দেবেশ রায়

রাত দেড়টায় অসিতের ফেরার আগে শিখার এক দফা ঘুম হয়ে যায়। রাত নটা-সাড়ে নটা নাগাদ পুপুন টিউশন নিয়ে ফেরার পর ছোটখাটো একটু কিছু খাওয়াও টুকটাক হয়ে যায়—মুড়িমাখার চাইতে বেশি, রুটি-তরকারির চাইতে কম।

অসিত ফেরার পর ওদের আসল রাত হয়। অসিত প্রায় রোজই ওদের রেস্তরাঁ থেকে কিছু-না-কিছু খাবার নিয়ে আসে। সামান্য কিছু। পুপুনের সেদিকেই নজর। শিখাও কোনো-কোনো দিন স্বাদ করে খায় সেটা। আবার, কোনো দিন একবারের বেশি দু-বার মুখে তোলে না। দু-একদিন এখনও বলে, এ-রান্না তো বাড়িতেই করা যায়, এই খাওয়ার জন্য লোকজন তেল পুড়িয়ে গাড়ি ঠেঙিয়ে সেই হুগলি যায়?

আবার, সেই শিখাই কোনো-কোনো দিন, কোনো কোনো খাবার মুখে দিয়ে বলে, আঃ একে বলে হোটেলের রান্না, কী স্বাদ, যতই চেষ্টা করো বাড়িতে এ তারই আসবে না।

শিখা অসিতকে বলেও, 'একটু শিখে আসতেও তো পারো, বাড়িতে চেষ্টা করতাম।'

অসিত বলে, 'কী যে বলো, ও-সব সসমস পাবে কোথায়। সারা পৃথিবী থেকে আসে। এ কী তোমাদের পাড়ার দোকানের গরমমশলা না পাঁচফোড়ন?'

অসিত কিন্তু রেস্তরাঁ থেকে আনা খাবার মুখেও তোলে না। বাড়ির রান্না চাই, গরম চাই, পর-পর দু-দিন এক ডাল, এক তরবারি হলে চলবে না। রোজ রাতে ডালের সঙ্গে নতুন ভাজা চাই ও সে ভাজা পাঁপড় বা উচ্ছে বা কাঁকরোল বা পটল হলে চলে না। রেস্তরাঁর কাজ সেরে অসিতের রাত দেড়টা নাগাদ বাড়ি ফেরার অন্তত আধঘণ্টাটেক আগে শিখাকে অসিতের রাতের খাবারের আয়োজন করতে হয়।

সেই কারণেই রাত নটা-সাড়ে নটার সেই টুকটাক খাওয়াটা কিছু ভারী হতে দেয় না শিখা, আবার-যে একটু বিড়াল-ঘুম দেয় সেটাকেও গা-ছাড়া ঘুম হতে দেয় না। টিভি দেখতে-দেখতে, বা, বড়জোর, পুপুনের বিছানাতেই একটু গড়িয়ে নেয়। পুপুনের এবার মাধ্যমিক। চৌকির সঙ্গেই ওর পড়ার টেবিল লাগানো।

খেতে-খেতে তো একটু গল্প হয়ই। যে-রেস্তরাঁয় অসিতের কাজ সেটা হাইওয়ের পাশে, কলকাতার বাইরে, অথচ গাড়িতে যেতে আর কতটুকু সময় লাগে। বার-কাম-রেস্তরাঁ। সব কিছুরই দাম আকাশছোঁয়া। দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল মদ। কোথাও কোনো এক চিমটে জালিয়াতি নেই। সামান্য একটু গানের ব্যবস্থা আছে—যারা গায় তাদের নাম কাগজে ছাপা হয়। কোনো-কোনো বিশেষ দিনে ভারতীয় ওস্তাদদেরও বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং। যদি মদ্যপান বেশি হয়ে যায়, তা হলে বললেই রেস্তরাঁর

ইউনিফর্মপরা ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে, গাড়ি গ্যারাজে তুলে, চাবি টেবিলে রেখে, আসবে। একেবারে পারিবারিক পরিবেশ। একটু বড় ছেলেমেয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু পরিবার বলতেও তো এখন একই রকম কিছু বোঝায় না। এ-সব রেস্তরাঁর একটা কোনো ইউনিক সেলস পয়েন্ট থাকে—যা দিয়ে রেস্তরাঁটাকে অন্য এমন রেস্তরাঁ থেকে আলাদা করা যায়।

এদের খাবারের মেনুতে সবই আছে—এক মোগলাই ও চায়নিজ বাদ। প্রধান জোরটা টার্কি, লেবানিজ ও সিরিয়ান খাবারের ওপর। কন্টিনেন্টাল তো আছেই, যদিও তার জোর গ্রিসের ওপর। আর পানীয়ের ব্যাপারেও এরা আন্তর্জাতিক। শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় ব্র্যান্ডনির্ভর নয়। ঐ দেশগুলির ও আরো কোনো-কোনো দেশের দেশীয় মদের সংগ্রহ আছে।

কিন্তু এদের যে-সার্ভিসটা নতুন বাজার তৈরি করে ফেলছে সেটা এই রেস্তরাঁ-সার্ভিসটারই হোম ডেলিভারি। সেটাও কলকাতায় পুরনো কিন্তু সেই বড় ধরনের ক্যাটারিং সার্ভিস এদের নয়। কলকাতায় পার্টি-দেয়া ও পার্টি-করাটা এখন এসে গেছে। তেমন পার্টি-দেয়ার জায়গাও তৈরি হয়েছে। এরা সেই সব জায়গায় পুরো পার্টি করে দেবে। কোনো হোটেলে পার্টি দেয়ার চাইতে এমন পার্টি দেয়ার স্ট্যাটাস অনেক বেশি। আজকাল অনেক হাউসিং কমপ্লেক্সে এনটারটেইনমেন্ট হল হয়েছে। তা ছাড়া বড় ইভেন্টের তো উপলক্ষের অভাব নেই। বিশেষ করে, প্রোডাক্ট-লঞ্চিঙের। এখন তো মেডিক্যাল প্রোডাক্টসের প্রোডাক্ট লঞ্চ একটা বড় ঘটনা। ছোটখাটো ও বড়সড়। তা ছাড়া ওয়েলকাম পার্টি, ফেয়ারওয়েল পার্টি, প্রিমিয়ার পার্টি, ফেস্টিভ্যাল পার্টি তো আছেই।

অসিতের রেস্তরাঁটা এই সেগমেন্টটাকে ধরে ফেলেছে। তাদের রেস্তরাঁর নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে এমন সোস্যাল ও বিজনেস লিডার ও ক্যাপটেনরা আছেন যে এদের ডেলিভারি সার্ভিসও সেই স্ট্যাটাস পেয়ে গেছে। বড়সড় পার্টির ইভেন্ট অর্গানাইজার হিশেবে এদের নাম নিমন্ত্রণকর্তার কার্ডে ছাপা থাকছে। খুব ছোট অক্ষরে।

অসিতের কাজ রেস্তরাঁতেও নয়, ইভেন্ট ডেলিভারিতেও নয়। তার কাজ হোম ডেলিভারিতে।

পার্টি-দেয়া বা পার্টি-করাটা পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠানও হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের অ্যানিভার্সারি ছাড়াও, আট-দশ-পনের জনের ছোট-ছোট গেট-টুগেদার পার্টি। তারও হয়তো নানা উপলক্ষ আছে—বিদেশ থেকে কোনো বন্ধু এসেছেন, বা, মেয়ে-জামাই বছর পাঁচ-সাত পর বাড়ি এসেছে, বা, মেয়ে একটা নতুন কোনো চাকরিতে জয়েন করেছে, বা, বিজয়াদশমী, দেওয়ালি, ভাইফোঁটার পার্টিও হতে পারে। নিকটজনরা একসঙ্গে একটু পার্টি করবে, সামান্য মদ্যপান ও ভাল খাবারসহ। কিন্তু একটু স্ট্যাটাসও থাকবে।

আগে থেকে তারিখ-টারিখ জানিয়ে রাখলে অসিতের রেস্তরাঁ এ-সব পার্টিতে খাবার ও পানীয় পৌঁছে দেয়, সার্ভিস দেয় না। আবার কোনো-কোনো এমন পার্টিতে ক্রকারিজ

দিতে হয়, মদ্যপানের বিশেষ গ্লাসসহ। তার চার্জ আলাদা। পৌঁছে দেবে ও পরদিন ফেরৎ নিয়ে আসবে। এমন কোনো-কোনো পার্টিতে 'বার'—রাখতে হয়—তারও চার্জ আলাদা—বারের সার্ভিসটুকু দেয়া হবে, একজন সার্ভারসহ একজন বারকিপার—পার্টির ইচ্ছে মত পুরুষ কিংবা মেয়ে।

অসিত ওদের রেস্তরাঁর এই হোমপার্টি-ডেলিভারি সার্ভিসটাতে আছে।

ওকে কোনো হোম-ডেলিভারি করতে যেতে হয় না, অর্ডারও তাকে নিতে হয় না। সে-সবের ব্যবস্থা আছে। তাকে দিন সাত আগে অর্ডারের লিস্টি দিয়ে দেয়া হয়। তার কাজ, সেই সব ঠিকানায় ডেলিভারি পাঠানো। ঘরোয়া পার্টিতে শুধু খাবার ও দু-এক বোতল পানীয়ের অর্ডার থাকলে তো মোটর-বাইকের পেছনে ডেলিভারি-বক্সেই চলে যায়। ডেলিভারি হয়ে গেলেই কাজ শেষ। যদি ক্রকারিজ-কাটলারিজ দিতে হয়, তা হলে দুটো ডেলিভারি-বাইক লাগে। যদি 'বার' রাখতে হয় ও সার্ভার দিতে হয় তা হলে যারা এই কাজ করে তাদের খবর দিলেই তারা ঠিকানায় পৌঁছে যায়। যদি একটু অচেনা জায়গার ঠিকানা হয়, বা নর্থের দিকে, বা এয়ারপোর্ট-মধ্যমগ্রামের দিকের ঠিকানা হয়, তা হলে, অসিত আগে একদিন বাইকে করে ঠিকানাটা দেখে আসে। আজকাল আড়িয়াদহ থেকে বারাসত পর্যন্ত যত্রতত্র বাড়ি উঠছে। সে-সব বাড়ি তো কেনে বাইরের লোক। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাদের কস্মিনকালে কোনো চেনাজানা দূরের কথা, মুখ দেখাদেখিও থাকে না। তারা ফ্ল্যাটগুলি কেনে কলকাতা বলে। শহরতলির ধারণাটাই নেই। সকালে যে-যার মত কাজে বেরিয়ে যায় কলকাতার দিকে। কাজের শেষে রাতে কলকাতা থেকেই ফিরে যে-যার হাউসিঙে ঢুকে যায়। কিন্তু এ-সব জায়গা তো পুরনো জায়গা। কোনো-কোনো জায়গা তো কলকাতা থেকেও পুরনো। অনেক জায়গা দেশভাগের পর তৈরি হলেও, তখনকার প্রথম বাসিন্দেরা ঐ সব জায়গার আদিবাসী হয়ে গেছে। আদিবাসী মানেই তো স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরববোধ, স্থানীয় মেলা, পুজো, নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্থানীয় কোনো বিশেষ দিন, স্থানীয় কোনো বিশেষ মন্দির/মাজার, পুকুর, জলাজমি, পুরনো বড় গাছ, আন্ডারগ্রাউন্ড নালা না-থাকায় জলনিকাশের সমস্যা ও প্রতিকার, এত সব বড়-বড় বাড়ি ওঠার ফলে মাটির তলার ওয়াটারলেবেলের হেরফের, কোনো রেললাইন গিয়ে থাকলে রেলওয়ে-ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাসের দাবিদাওয়া, খোলা লেবেলক্রসিঙের বদলে গেটওয়ালা লেবেলক্রসিং—এই সবই তো আদিবাসীদের জীবনযাপনের সমস্যা। সে-জীবন পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছরের পুরনো হলেও ও সেই সব জীবন যাঁরা ঐ সব সমস্যাগুলো আবিষ্কার করতে-করতে, মেটাতে-মেটাতে, না-মেটাতে না-মেটাতে কাটিয়ে গেছেন, তাঁদের নাতিপুতিরাও তো সেই স্থানীয় ইতিহাসেরই ভিতরে আছেন। এ ছাড়া ভোটাভুটি, পার্টিপুর্টি এ-সব তো আছেই। কিন্তু এই সব হাউসিং এস্টেট বা টাউনশিপের লোকজনের সঙ্গে তো ঐ স্থানীয় জীবনের না আছে পুরুষানুক্রমিক বা

গাড়ি যেতে দেব না। প্রমোটারকে ফোন করলে সে বলল, একটু টাইম নিন, পুলিশ যাবে। টাইম আর নেয়া যাবে কী ভাবে। চুপচাপ বসে থাকা। মেয়ে দুটি গাড়ির ভিতর বসে না থেকে বাইরে বেরতেই—ছেলেগুলো যেন ক্ষেপে উঠল। নতুন করে কেন খেপল সেটা বুঝতে একটু সময় গেল। ছেলেগুলো তখন গাড়ি ঘিরে ধরে চেঁচাতে শুরু করেছে—'এ তো পরিষ্কার মাল-মেয়েমানুষ-মোদো-মাতালের ব্যাপার, এখানে মধুচক্র বসানো হবে রেগুলার। এ কি মগের মুলুক—যা ইচ্ছে তাই কেচ্ছা হবে? আমাদের জায়গার সুনাম-দুর্নাম নেই। গাড়ি ভর্তি মেয়েছেলে আর বোতল নিয়ে এসে ফুর্তি হবে!' মুশকিল বেধে গেল—মেয়েদুটির কাজ কী সেটা তো তাদের বলাও যাচ্ছে না—তা হলে তো গোলমাল আরো বাড়বে।

প্রমোটারকে ফোন করতে সে বলল, 'একটু ওয়েট করুন। ঘন্টুদাকে জিগগেস না করে পুলিশ আসতে চাইছে না। ছেলেগুলো ঘন্টুদার ছেলে না শম্ভুবাবুর ছেলে না জেনে পুলিশ আসবে না। একটু ওয়েট করুন।'

মেয়েদুটো ভয়ে গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে কাঁপছে।

অসিত তার রেস্তরাঁর ম্যানেজারকে ফোন করে সব জানাতেই তিনি বললেন, তুমি কেটে এসো, ঐ মেয়েদুটি তো কনট্র্যাক্ট-কনট্র্যাক্ট। আমাদের স্টাফ না। শেষে আমরা আরো গোলমালে পড়ব। কেটে এসো। যত তাড়াতাড়ি পারো।'

অসিত তখন ছেলেগুলিকে বলে, 'শুনুন ভাই, আমাদের ব্যাবসার কাজ, যে অর্ডার দেয় তার কাজ করি। আপনাদের আপত্তি আমরা মেনে নিচ্ছি—আমরা এ সব ঝামেলায় থাকব না। আমরা ফিরে যাচ্ছি—যাঁরা অর্ডার দিয়েছিলেন, তাঁদের জানিয়ে দিয়েছি, আপনাদেরও জানিয়ে দিলাম। এই গাড়ি ঘোরান—'

ড্রাইভারটা খুব চালাক ছিল, সে চট করে গাড়িটা ব্যাক করে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল আর অসিতও তার বাইকে চেপে বসল হেলমেট ছাড়াই। স্টার্টও দিল। ছেলেগুলো ব্যাপারটা আন্দাজই করতে পারে নি যে ঘটনাটা এমন উল্টে যাবে।

এমন সব গল্প তাদের রাতের খাওয়ার সময় হয়। পুপুল আর শিখা গল্পগুলোতে বেশ মজা পায়। প্রত্যেক গল্পেই শেষ পর্যন্ত অসিত কী করে ঝামেলা এড়াল সেই মজাটুকু থাকে। তাই, গল্প শোনার সময় উদ্বেগগুলো গল্পশোনাটাকে ব্যাহত তো করেই না, বরং শেষে যে সব মিটে যাবে এমন ভরসায় ঐ উদ্বেগটুকু গল্পটাকে একটু রোমাঞ্চই দেয়, রাতের খাওয়ার ঐ সময়টুকু জুড়ে—বাড়িতে বসে টিভিতে সিনেমার মারপিট্টি দেখার মত।

কিন্তু হঠাৎই একদিন, আচমকা, এই গল্পগুলি থেকে রোমাঞ্চ ও মজাটা একেবারে মুছে গেল, আর কপট ভয়টা সত্যিকারেরই ভয় তো হয়ে উঠলই, কঠিন-কঠিনতরও হয়ে গেল, যেন ভূমিকম্পের মত, পূর্বাভাসহীন, পরিত্রাণহীন ও অনিশ্চিত —কতক্ষণ চলবে এই কম্পন, ফিরে আসবে কী না, এলে কতবার ফিরে আসবে, কত কী একেবারে চিরকালের মত

গাড়ি যেতে দেব না। প্রমোটারকে ফোন করলে সে বলল, একটু টাইম নিন, পুলিশ যাবে। টাইম আর নেয়া যাবে কী ভাবে। চুপচাপ বসে থাকা। মেয়ে দুটি গাড়ির ভিতর বসে না থেকে বাইরে বেরতেই—ছেলেগুলো যেন ক্ষেপে উঠল। নতুন করে কেন খেপল সেটা বুঝতে একটু সময় গেল। ছেলেগুলো তখন গাড়ি ঘিরে ধরে চেঁচাতে শুরু করেছে—'এ তো পরিষ্কার মাল-মেয়েমানুষ-মোদো-মাতালের ব্যাপার, এখানে মধুচক্র বসানো হবে রেগুলার। এ কি মগের মুলুক—যা ইচ্ছে তাই কেচ্ছা হবে? আমাদের জায়গার সুনাম-দুর্নাম নেই। গাড়ি ভর্তি মেয়েছেলে আর বোতল নিয়ে এসে ফুর্তি হবে!' মুশকিল বেধে গেল—মেয়েদুটির কাজ কী সেটা তো তাদের বলাও যাচ্ছে না—তা হলে তো গোলমাল আরো বাড়বে।

প্রমোটারকে ফোন করতে সে বলল, 'একটু ওয়েট করুন। ঘন্টুদাকে জিগগেস না করে পুলিশ আসতে চাইছে না। ছেলেগুলো ঘন্টুদার ছেলে না শম্ভুবাবুর ছেলে না জেনে পুলিশ আসবে না। একটু ওয়েট করুন।'

মেয়েদুটো ভয়ে গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে কাঁপছে।

অসিত তার রেস্তরাঁর ম্যানেজারকে ফোন করে সব জানাতেই তিনি বললেন, তুমি কেটে এসো, ঐ মেয়েদুটি তো কনট্র্যাক্ট-কনট্র্যাক্ট। আমাদের স্টাফ না। শেষে আমরা আরো গোলমালে পড়ব। কেটে এসো। যত তাড়াতাড়ি পারো।'

অসিত তখন ছেলেগুলিকে বলে, 'শুনুন ভাই, আমাদের ব্যাবসার কাজ, যে অর্ডার দেয় তার কাজ করি। আপনাদের আপত্তি আমরা মেনে নিচ্ছি—আমরা এ সব ঝামেলায় থাকব না। আমরা ফিরে যাচ্ছি—যাঁরা অর্ডার দিয়েছিলেন, তাঁদের জানিয়ে দিয়েছি, আপনাদেরও জানিয়ে দিলাম। এই গাড়ি ঘোরান—'

ড্রাইভারটা খুব চালাক ছিল, সে চট করে গাড়িটা ব্যাক করে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল আর অসিতও তার বাইকে চেপে বসল হেলমেট ছাড়াই। স্টার্টও দিল। ছেলেগুলো ব্যাপারটা আন্দাজই করতে পারে নি যে ঘটনাটা এমন উল্টে যাবে।

এমন সব গল্প তাদের রাতের খাওয়ার সময় হয়। পুপুন আর শিখা গল্পগুলোতে বেশ মজা পায়। প্রত্যেক গল্পেই শেষ পর্যন্ত অসিত কী করে ঝামেলা এড়াল সেই মজাটুকু থাকে। তাই, গল্প শোনার সময় উদ্বেগগুলো গল্পশোনাটাকে ব্যাহত তো করেই না, বরং শেষে যে সব মিটে যাবে এমন ভরসায় ঐ উদ্বেগটুকু গল্পটাকে একটু রোমাঞ্চই দেয়, রাতের খাওয়ার ঐ সময়টুকু জুড়ে—বাড়িতে বসে টিভিতে সিনেমার মারপিট্টি দেখার মত।

কিন্তু হঠাৎই একদিন, আচমকা, এই গল্পগুলি থেকে রোমাঞ্চ ও মজাটা একেবারে মুছে গেল, আর কপট ভয়টা সত্যিকারেরই ভয় তো হয়ে উঠলই, কঠিন-কঠিনতরও হয়ে গেল, যেন ভূমিকম্পের মত, পূর্বাভাসহীন, পরিত্রাণহীন ও অনিশ্চিত —কতক্ষণ চলবে এই কম্পন, ফিরে আসবে কী না, এলে কতবার ফিরে আসবে, কত কী একেবারে চিরকালের মত

ভেঙে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে ও যাকে পরিবার বলে, বাড়ি বলে, সমাজ-সংসারও বলে সে-সব চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান মানে তো যে-কোনো ঘটনার যুক্তি ও যুক্তির শৃঙ্খলা এমন প্রামাণিক করে তোলা যে যতবার সেই যুক্তিগুলিকে সেই শৃঙ্খলায় সাজানো যাবে, ততবারই ঘটনাটি ঘটবে। ভূমিকম্পও কি এমন যুক্তিশৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনা যে সেই যুক্তিশৃঙ্খলার পুনর্বিন্যাসে, যথাযথ পুনর্বিন্যাসে ভূমিকম্প ঘটিয়ে ফেলা যায় অনিবার্য? তা হলে, ভূমিকম্পের সঙ্গে কেবল তুলনীয় সেই পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক ঘটনাগুলিও তেমনই অনিবার্য?

রাতে, শুতে এসে, না শুয়ে, বসে, অসিত শিখাকে জিগগেস করে, 'তুমি কি আজ টিভি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, যেমন দেখি, কেন?'

'টিভিতে নাকী একটা লোককে দেখিয়েছে, তার মুখ নাকি কেউ দেখতে পায় নি, হেলমেট দিয়ে ঢাকা ছিল। দেখেছ?'

'যা কেউ দেখতে পায় নি, সেটা আমি দেখব কী করে? অ্যাড্ না নিউজ?'

'নিউজই হবে।'

'নিউজ আমি দেখি না। তখন সিরিয়্যাল থাকে।'

'সেই লোকটা নাকী বলেছে—তার নাম অসিত দাস।'

'তার যা নাম, সে তো তাই বলবে। তুমি পরিষ্কার করে বলছ না কেন, আমাকে কী জিগগেস করছ। আমার কাছে জানতে চাইছটা কী?'

'তুমি দেখে থাকলে জিগগেস করতাম, তাকে কি আমার মত দেখতে?'

'বললে তো তার মুখ হেলমেট দিয়ে ঢাকা ছিল। কেউ মুখটা দেখতেই পায়নি। আমি দেখলেও কী করে চিনতাম তোমার মত কী না?'

'ওঠাবসা, কথাবলা এ-সব দিয়েও তো মানুষ চেনা যায়।'

'তোমাকে এটা কে বলল? কার কাছে শুনলে?'

'আমাদের তখন ডিনার শুরু হয়েছে। ডিনারের সময় আমাদের নিউজচ্যানেলটা খুলে দেয়া হয়। অনেক ক্লায়েন্টের অভ্যেস টিভি-নিউজ দেখতে-দেখতে খাওয়া। আমি প্যানট্রিতে ছিলাম। ফ্লোর-ম্যানেজার এসে বলল—এই অসিত, তোকে দেখাচ্ছে তো টিভিতে, যা দেখে আয়। ভাল স্টার্টার দিয়েছিস রে ডিনারে। তুই বলছিস—ঐ মুম্বাইয়ে যে-মেয়েটাকে ওর মা মার্ডার করল সেই মেয়েটা তোর মেয়ে। মানে, তোর আর ইন্দ্রাণী মুখার্জির মেয়ে। তোরা তখন লিভ-টুগেদার করতি। তোদের একটা ছেলেও আছে। ডিনারের দারুণ স্টার্টার। যা দেখে আয়। আমি গিয়ে দেখি তখন অন্য নিউজ হচ্ছে।'

'তোমাদের ম্যানেজারের টিভির কাউকে দেখে মনে হয়েছে, সে তোমার মত দেখতে, তোমাকে তাই এসে বলেছেন—যা দেখে আয়। এই তো?'

'ফ্লোর ম্যানেজার তো প্যানট্রিতে সবার সামনেই বলল। বলে হাসলও। সার্ভাররাও তো ছিল, তারাও হাসল। তারাও দেখেছে। একজন বলল—'হেলমেট দিয়ে মুখটা ঢাকলেন কেন স্যার।' আর-একজন তার উত্তরে বলল—'বললই তো অসিতদা। মালিক যদি চেনে আমার চাকরি চলে যাবে। তাই মুখটা ঢেকে রেখেছি। আমার এক ছেলে—সে এবার মাধ্যমিক দেবে। চাকরি গেলে আমার চলবে কী করে?' আর-একজন বলল—'সব তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে অসিত দা। ঐ টিভির অসিত দাসও বেলগাছিয়ায় থাকে।'

'হ্যাঁ। ঐ লোকটাও তো অসিত দাস—'

'পৃথিবীতে তো আরো কোটি-কোটি অসিত দাস থাকতে পারে। আছেও। নামের যা ছিরি। অসিত, অরুণ, অশোক, জীবন, আশিস, সুজিত, সুমিত এ সব আবার একটা-লোকের নাম হয় না কী? সব লোকেরই নাম।'

'ঐ লোকটা তো অসিত কুমার, অসিত চন্দ্র, এমন কিছুও হতে পারত, একেবারে অসিত দাসই হয়ে গেল। বলল তো সবাই, সবই তোমার মত।'

'সে তো তুমিও হতে পারতে। কাল থেকে কুমার, চন্দ্র, নাথ, নারায়ণ, চরণ কিছু-একটা লাগিয়ে নিয়ো।'

'এখন আর হয় না। তা হলে তো আরো প্রমাণ হয়ে যাবে যে ধরা-পড়ার ভয়ে আমি শেষ মুহূর্তে নাম বদলেছি।'

'ধরা-পড়া মানে?'

'ঐ যে খুন হয়েছে, সে-মেয়েটি আমারই মেয়ে, সেটা ধরা-পড়ার ভয়ে—'

'তুমি যদি সত্যি করেই মেয়েটির বাবা হয়ে থাকো, না-হয় হলে, খুনি তো আর হও নি। নাকী তাও হয়েছ বলে ভাবছ—'

'আমি আর কী ভাবব? অসিত দাস আর-কী ভাবছে সেটা আমি কী করে জানব? সেও তো বেলগাছিয়াতেই থাকে।'

'তা তো এতক্ষণ বলো নি। বেলগাছিয়াতেই?'

'ওরা তো সকলেই তাই বলল, রেস্তরাঁতে।'

শিখা-অসিতের সম্বন্ধ করেই বিয়ে, চেনাজানার মধ্যেই, বছর আঠার হল। বিয়ের দু-বছর পেরতেই পুপুন। কোনো অসাবধানতাবশতও নয়, আবার কোনো প্ল্যান করেও না। স্বভাববশতই। বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হবে না? তার পরেও যে আর হয়নি সেটা অবিশ্যি দু-জনেরই পরিকল্পনাবশত। এতটাই নিশ্চিত দাম্পত্যের পর, এখন, মাঝরাত—পেরনো নিশুতিতে, শিখা অসিতের দিকে তাকিয়ে থাকে, বিয়ের পরপরের নিশুতির অন্ধকারে যেমন থাকত, লোকটাকে মাপতে, লোকটা কেমন, নিজেকে তার হাতে পুরোটা তুলে দিচ্ছি। কিন্তু এখন, কথাটা জিগগেস করে বসে এমন ভাষায়, যে-ভাষা বিয়ের বছরের হিশেব-নিকেশ ভুলে না গেলে মুখে আসে না—গলাটা একটু নামিয়ে—'তোমার ঐ হোটেলের

লোকজন, মানে, তুমি যাদের সঙ্গে কাজ করো, তোমার চাইতে বড় পোস্টে যারা বা তোমার আন্ডারে যারা, তারা, কি তোমার পেছনে লাগে, মানে...'।

শিখা হঠাৎ শব্দ হারিয়ে ফেলে, কিন্তু এমন প্রশ্নে শব্দটা, ঠিক শব্দটা, নেহাৎই দরকারি, নেহাৎই। যেমন, কেউ শিখিয়ে না দিলেও, পুপুন পেটে-আসার আগে পর্যন্ত শিখা স্বভাববশতই জেনে গিয়েছিল নেহাৎ দরকারি চুপ-করে-থাকাগুলি। আর, পুপুন পেটে আসার পর সেই একই স্বভাববশত জেনে ফেলেছিল, —অত্যন্ত দরকারি সব নিবিড় ও অব্যর্থ শব্দগুলি, অসিতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। তেমনি একটা নীরবতা বা শব্দ শিখার পক্ষে নিদারুণ প্রয়োজন হয়ে পড়ল ও নীরবতা আর চলে না বুঝে, শিখা বলে বসে, 'মানে, তোমার পেছনে লেগে মজা পায়, তোমার কোনো মুদ্রাদোষ বা বাতিক বা অভ্যেস...'

যে-কথাটা বলতে শিখা এত কথা হারিয়ে ফেলেছিল, সে-কথাটা কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই অসিত বুঝে ফেলে বলে ওঠে, 'আরে একসঙ্গে সারা দিন এত মানুষের সঙ্গে এত কাজ। একটু মজাকি না-হলে কি চলে?

'আমি তো তাই বলছি। ওরা তোমাকে নিয়ে একটু মজা করেছে। তুমি সেটাকে এতটা সত্যি বলে ধরে নিলে কেন?'

'ঐ-যে নামের মিল, বেলগাছিয়ারও মিল। মার্ডার কেস তো। পুলিশ যদি ভুল করেও একবার ধরে তা হলে তো সর্বনাশ। পুলিশের ভুল সহজে ভাঙে না। সাক্ষী সাজিয়ে হাকিমের কাছে বলে দেবে—এই সেই অসিত দাস, যে-মেয়েটি খুন হয়েছে তার বাবা, ইন্দ্রাণী মুখার্জির লিভ-টুগেদারের পার্টি।'

'কী যে বলো তার মাথামুণ্ডু নেই।'

'যা ঘটছে রাতদিন, এই ঘটনাটিতেই যা ঘটেছে তার কি খুব মাথামুণ্ডু আছে? আমি দাঁড়িয়ে আছি প্যানিট্রিতে আর ফ্লোর-ম্যানেজার এসে বলল তোকে টিভিতে দেখাচ্ছে, আরো সবাই তো বলল। সবাইই তো বলল—একেবারে তুমি, অসিত দাস, বেলগাছিয়া, শুধু এখনকার চাকরির জায়গাটা বলে নি। সেটুকুই যা বাকি আছে।'

'সেটুকু তো বাকিই থাকবে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এ কি মগের মুলুক না কী? তোমার নামের সঙ্গে মিল, থাকার জায়গার সঙ্গে মিল আর অমনি তুমি একটা খুন হওয়া-মেয়ের বাবা হয়ে যাবে আর একটা খুনী মেয়ে-মানুষের এককালের বাবু হয়ে যাবে?'

'যে নিজের মেয়েকে নিজের বোন বলতে পারে আর নিজের বাপকে নিজের মেয়ের বাপ বলতে পারে তার পক্ষে বেলগাছিয়ার এক অসিত দাসকে তার এক সময়ের বাবু বলতে অসুবিধে কী? পুলিশ যদি তাকে তেমন বলতে বলে—'

'কী যে বলো! তুমি আমাকে এমন রাত্তিরে এমন ভয় পাইয়ে দিচ্ছ কেন। তুমি ছাড়া আমাদের, আমার আর পুপুনের আছেটা কে?'

'আমি ভয় পেয়েছি বলেই তো বাঁচতে চেয়ে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি।'

'অ্যাদ্দিন যে কোনো ভয়-ডর পাই নি সেটা বুঝি বাঁচা হয় নি আমাদের?'

'সেই ভেবেই তো সবাই বেঁচে থাকে। সবাই কি একসঙ্গে ভয় পায়, ভূমিকম্পে যেমন?'

'যার যার ভয় তার তার?'

'রেস্তরাঁর আর-সবার কাছে তো ওটা ঠাট্টাই। তোমার কাছেও। ঐ অসিত দাস আর ঐ বেলগাছিয়ার মিল। এক আমার কাছেই ভয়।'

'তোমার ভয়টা কীসের আসলে, বলো-না। ধরো' পুলিশ তোমাকেই ধরল, ঐ মিলটুকুর ছুতোতেই ধরল। কিন্তু তুমি তো আর সত্যি-সত্যি সে-অসিত দাস নও। পুলিশ তোমাকে ধরল, তোমার কষ্ট, আমরা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কোর্ট-কাছারি করতে লাগলাম। দু-দিনই হোক আর দশদিনই হোক, ছাড়তে তো তোমাকে হবেই। তুমি তো আর ঐ অসিত দাস হয়ে যেতে পারো না।'

'ঐ ধারণাটুকু আছে বলেই তো বেঁচে আছি। কিন্তু ভয় যদি একবার পাইয়ে দেয়া যায়, তা হলে সে আর বাঁচতে পারে না। মধ্যমগ্রামের মেয়েটি পারল?'

'কোন্ মেয়েটি?'

'যে-মেয়েটিই হোক। দু-বার রেপ। জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় এসেও তো মেয়েটি বাঁচে নি। বেঁচে থাকতে ভয় পেয়েছে, পিসি বলে ডাকে, রাস্তায় জাপটে ধরে অপমান করল। সে-মেয়েটিও তো ভয় পেল বেঁচে থাকতে। একটা ষোল-না-সতের বছরের মেয়ে, দুটো বদমাসকে পিটিয়ে নিজেকে বাঁচালো। তার বাড়িতে মাঝরাতে পুলিশ! মেয়েটি ভয় পেল না কেন।'

'কীসের সঙ্গে কী? পান্তাভাতে ঘি। এগুলো তো এক-একটা ঘটনা, এক-এক রকম। তোমার নাম আর জায়গার একটা লোক, কী মামলায় ফেঁসেছে আর তুমি ভয় পাচ্ছ! তোমার কথাতে আমিও যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বাদ দাও তো—যত সব!'

পরদিন সকালে খবরের কাগজে বেলগাছিয়ারই দুই অসিত দাসের আরো কিছু মিল অবিশ্যি জানা গেল। দুই অসিত দাসই শিলঙে ছিল একসময়। তাদের মধ্যে কোন অসিত দাসের সঙ্গে ইন্দ্রাণী মুখার্জির সম্পর্ক ঘটেছিল সেটা তো পুলিশ জানাবে।

রেস্তরাঁয় যাওয়ার সময় অসিত হেলমেটের সামনের স্বচ্ছ ঢাকনাটাও নামিয়ে দিল। বেলগাছিয়া থেকে হুগলি যেতে বা রেস্তরাঁ থেকে শহরে, অর্ডার অনুযায়ী হোম-সার্ভিসেস-ডেলিভারি দিতে গেলে, তার মুখটা যেন কেউ দেখে না ফেলে। ও তাকে চিনে না ফেলে।

যতদিন পুলিশ এসে হেলমেটটা না খোলে, ততদিন তার বেঁচে-থাকা ও চলাফেরার উপায় আপাতত ঐ একটাই—হেলমেটে মুণ্ডু ঢেকে রাখা।